নিরামিষ-তন্ত্রের দমনপীড়ন

জহর সরকার

জানেন কী, এই হালে গঠিত মধ্যপ্রদেশের নতুন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কী ছিল? না, গ্রাম বা শহরের উন্নতি বা গরিব কল্যাণ তো নয়-ই, এমনকি কর্মসংস্থান বৃদ্ধিও সেখানে স্থান পায়নি। তাদের প্রথম ফরমান হল খোলা বাজারে মাছ-মাংস বা ডিম বিক্রি করা যাবে না। এর অনেক আগেই এই রাজ্যে ও অন্য বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিদ্যালয়ের মিড-ডে মিলে ডিম বন্ধ করা হয়েছে, যদিও ডাক্তার বলেন অপুষ্ট বাচ্চাদের জন্যে ডিম খুবই স্বাস্থ্যকর। এক ধাক্কায় কয়েক লক্ষ লোকের রুজি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেল। বোঝা যায়, এই কঠোর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা শুধু একটি ধর্মকেন্দ্রিক কট্টর মতবাদের পরিচয়ই দেয় না, এর পিছনে আছে কিছু গোঁড়া উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিপত্য।

এই ঘটনা দেখে মনে পড়ল, কয়েক দিন আগের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈশভোজের কথা। প্রধানমন্ত্রী এসেছিলেন। কিন্তু তাঁর দিকে না গিয়ে অনেকেই স্বাভাবিক ভাবে বুফে টেবিলে কী কী খাবার সাজানো আছে, দেখতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কিছু ক্ষণ পর বেশ কয়েক জন হতাশ হয়ে ফিরে বললেন, “যাহ্! শুধু নিরামিষ!” ওই ভোজ দেখে এত হতাশার সত্যিই কিছু নেই কারণ, দিল্লি তথা উত্তর ভারতে সব সরকারি অনুষ্ঠানের ভোজে শুধু নিরামিষই পরিবেশন করা হয়। আগেও জায়গা বিশেষে তা-ই হত, কিন্তু অন্যান্য সরকারি ভোজে এলাহি মাছ-মাংস থাকত। গত এক দশকে রাজধানী চত্বরে আমিষের কোনও স্থান নেই বললেই চলে, আর যতটুকুও বা আছে তা নির্মূল করার জন্য এক যুদ্ধকালীন প্রয়াস চলছে। শুধু সরকারি বা সংসদের নিমন্ত্রণ ছাড়াও অন্যান্য ভোজে মাছ-মাংস খুবই বিরল।

আর এ কেবলমাত্র দিল্লির গল্প নয়, সারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতে একই চিত্র। কিন্তু সম্পূর্ণ দোষ বা কৃতিত্ব একটি সরকারকে দেওয়াও ঠিক নয়। দু’দশক আগেও দিল্লি থেকে আগরা লম্বা হাইওয়ের দু’পাশে একটিও আমিষাশী ধাবা চোখে পড়ত না, কেবল শুদ্ধ বৈষ্ণব ধাবা— যেখানে নিরামিষ ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যেত না। যদিও উত্তর ও পশ্চিম ভারতের এই প্রবণতা আগেই লক্ষণীয় ছিল, স্বীকার করতেই হয় যে, গত দশ বছরে এর দাপট প্রচণ্ড বেড়েছে। সঙ্গে বেড়েছে এক অদ্‌ভুত অসহিষ্ণুতা।

বাংলার বাইরে না গেলে বোঝা যায় না উত্তর ও পশ্চিমের কয়েকটি রাজ্যে আমিষ বন্ধ করার জন্য কী জোর-জবরদস্তিই না চলছে! বহু দিন আগে থেকেই গুজরাতের অনেক বড় শহরে প্রকাশ্যে কোনও আমিষ খাওয়া বা বিক্রি করা যায় না। হিন্দুদের পবিত্র স্থানে অনেক বছর ধরেই মাছ-মাংস বন্ধ এবং বেশ কড়া নিয়ম মানা হয়। মন্দিরের কাছাকাছি স্থানে এই নিষেধাজ্ঞা বোঝা গেলেও যে ভাবে একের পর এক শহরের আমিষ খাবারের বিরুদ্ধে আইন জারি হচ্ছে তা সত্যি চিন্তাজনক। হরিদ্বার তো ১৯৫৬ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিরামিষ। তার পর উত্তরপ্রদেশের হৃষীকেশ, বৃন্দাবন, বরসানা, চিত্রকূট ইত্যাদি শহরে বন্ধ হল আমিষ খাদ্য। এমনকি মুসলমানদের পবিত্রক্ষেত্র দেওবন্দেও এখন নিরামিষ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। এই নিয়ম থেকে রেহাই পায়নি বারাবঁকি জেলার ছোট্ট শহর দেওয়া শরিফ যা হাজি ওয়ারিস আলি শাহের মাজারের জন্য বিখ্যাত। কিন্তু একটু ভাল করে দেখলেই বোঝা যায় যে, এই সব প্রতিবন্ধকতা শুধুই মুসলমানদের মুশকিলে ফেলার জন্য নয়। যদিও মাংসের ব্যবসা বন্ধ করলে তাঁদেরই বেশি ক্ষতি হয় আর তাঁদের উপর নির্যাতন কমার তো কোনও প্রশ্নই নেই। এই

নির্দেশগুলি এখন আসলে হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশের বিরুদ্ধে, যাঁরা উত্তর ভারতের গো-বলয়ের গোঁড়া নিয়ম কোনও দিনই গ্রহণ করেননি। অন্তত উনিশ শতকের নবজাগরণের পরে তো নয়-ই।

নিরামিষ খাবার চাপিয়ে দেওয়ার প্রবণতার সঙ্গে যে দৃঢ় কর্তৃত্ব জড়িয়ে আছে তা নিয়ে একটু চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, মানুষ কী খাবে আর কী খাবে না তা তাঁর একেবারেই ব্যক্তিগত ব্যাপার যা অনেকখানি নির্ভর করে সংস্কৃতি আর রুচির উপর। তার সঙ্গে আছে ধার্মিক বিশ্বাস এবং পরিবারের বা জনগোষ্ঠীর নিয়ম-কানুন। হিন্দু ধর্ম বরাবর বহুত্বে বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, এখন তাকে একটি সঙ্কীর্ণ একরূপী অভিন্ন ব্র্যান্ড-এ পরিণত করা হচ্ছে।

আহারের স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক অধিকার, যা ভারতীয় সংবিধানের দ্বারা স্বীকৃত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, আদালতের রায় সাধারণত সরকারের পক্ষেই যায়। মাস পাঁচেক আগে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষদ্বীপের স্কুলের ছাত্রদের মধ্যাহ্নভোজে মুরগি আর ডিম বন্ধ করার পক্ষে একটি নির্দেশের সমর্থন জানিয়েছে। ২০০৪ সালে উচ্চতম আদালত ঘোষণা করেছিল যে, হরিদ্বারের পুরসভার ডিম বিক্রয় বন্ধ করার হুকুমটি আইনসঙ্গত। আর পুরসভার নির্দেশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীকে আদালত জানিয়ে দিয়েছে যে, এই নির্দেশে তার কোনও মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হচ্ছে না। আবার অন্য দিকে, গুজরাতের হাই কোর্ট খুব কড়া ভাষায় আমদাবাদ নগর প্রশাসনকে জানিয়েছে, রাস্তাঘাট থেকে আমিষ খাবার সরিয়ে ফেলার আদেশ একেবারেই বেআইনি।

আসা যাক পরের প্রশ্নে, কাদের সংখ্যা বেশি? ২০০৫-০৬'এর কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য গবেষণা অনুযায়ী, এ দেশে শতকরা ২৫ জন নিরামিষাশী। ২০১২-র ভারতীয় মানব বিকাশ সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাত্র ২৪ শতাংশ লোক শুধু নিরামিষ খান। একই বছরের জাতীয় নমুনা-ভিত্তিক নিরীক্ষা অবশ্য বলে, ৩৬ শতাংশ ভারতীয়রা নাকি নিরামিষাশী। এর পর ২০১৮-য় 'ইন্ডিয়াস্পেন্ড' সমীক্ষা করে বলে, ভারতে ৮০ শতাংশ পুরুষ আর ৭০ শতাংশ মহিলা আমিষ খান বা খেতে কোনও দ্বিধা করেন না। ২০১৯-২১ সালের সরকারের নিজের জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য গবেষণা দেখায় প্রায় ৭৫ শতাংশ ভারতীয় কখনও না কখনও ডিম, মাছ বা মাংস খেয়েছেন আর এখনও সুযোগ পেলে বা সামর্থ্য থাকলেই খান। ২৫টি রাজ্য বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অধিকাংশ মানুষ সামর্থ্য থাকলেই আমিষ খান, অন্তত ডিম খেতে ভালবাসেন।

সমীক্ষার ফল অনেকখানি নির্ভর করে তার নমুনা আর তার আকার বা আয়তনের উপর। অতএব কিছু হেরফের হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মনে হয়, গড়ে দেশের প্রতি চার জনের মধ্যে তিন জন আমিষ খান বা খেতে আপত্তি নেই।

রাজ্যভিত্তিক তথ্য দেখলে বোঝা যায়, মাত্র পাঁচটিতে নিরামিষাশীর সংখ্যা অনেক বেশি। এগুলি সব পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিমের। ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেল ২০১৮ সালে জানিয়েছেন, রাজস্থানে ৭৫ শতাংশ লোক নিরামিষ খান, যা হরিয়ানায় গিয়ে হয়ে যায় ৬৯ শতাংশ, পঞ্জাবে ৬৭ শতাংশ, গুজরাতে ৬১ শতাংশ আর হিমাচলে ৫৩ শতাংশ। মধ্যপ্রদেশ একেবারে ৫০:৫০। আর যে উত্তরপ্রদেশ আমিষের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাচ্ছে, সেখানে আসলে আমিষাশী হল সংখ্যাগরিষ্ঠ— শতকরা ৫৩ জন। বাকি সব রাজ্যে নিরামিষাশীরা একেবারেই সংখ্যালঘু। মহারাষ্ট্র, জম্মু ও কাশ্মীর আর উত্তরাখণ্ডে তাঁদের সংখ্যা ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ। কেবল কর্নাটক বাদ দিলে দক্ষিণ ভারত ও পূর্বাঞ্চলে আমিষাশীর সংখ্যা ৯৭ থেকে ৯৯ শতাংশ।

এই ছবিটি মানচিত্রে দেখলে আশ্চর্য লাগে— পশ্চিম আর উত্তর-পশ্চিম ভারত কেমন যেন এক দিকে আর এ দেশের বাকি রাজ্যগুলি বিপরীতে।

এই সব প্রথার কারণ ঐতিহাসিক। পরিসংখ্যান বলে যে, গরিব লোকেদের একটু আয় বাড়লেই তাঁরা দুধ আর

ডিমের উপর খরচ করেন, আর মাছ-মাংস পেলে তো কথাই নেই, যদি না জাতের প্রবল বাধা থাকে। কিন্তু এই আমলে আমিষ-বিরোধী অভিযানে কোনও বিরাম নেই।

কেন এই চাপ? এর উত্তর মেলে ধর্মের অসহিষ্ণুতায়, সংস্কৃতির সঙ্কীর্ণতায় আর রাজনৈতিক অহঙ্কারে। এই তিনটি কিন্তু নির্বিবাদে একত্রিত হলে ভয়ঙ্কর। শুধু একটি ধর্মের প্রাধান্য নিয়ে রাজনীতি করলে যে গোষ্ঠীযুদ্ধ অনিবার্য তা পাকিস্তানের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। ভয় লাগে— উদার হিন্দুধর্মে যেন হঠাৎ করে সঙ্গিন অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীবিবাদ না শুরু হয়ে যায়।